অধ্যায় এক

কিছুই না করার গল্প

[শূন্যের সূচনা]

তখন অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব কোনোটাই ছিল না। ছিল না স্থানের জগৎ, আর না ছিল তার বাইরের আকাশ। কে জাগাল? কোথায় জাগাল?

-ঋগ্বেদ

শূন্যের গল্প খুব পুরনো। গণিতের জন্মের সময়েই এর জন্ম হয়। সে আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগের কোথা। তখনও প্রথম সভ্যতারও জন্ম হয়নি। মানুষের লিখতে-পড়তে পারারও বহু আগের কথা। শূন্যকে আজ আমাদের কাছে খুব স্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু প্রাচীনকালের মানুষের কাছে সংখ্যাটিকে বহিরাগত মনে হয়। ভীতিকর মনে হত।

ধারণাটির জন্ম প্রাচ্যের ফার্টাইল ক্রিসেন্ট১ বা উর্বর চন্দ্রকলা অঞ্চলে। খ্রিস্টের জন্মের কয়েক শ বছর আগে। এই শূন্য শুধু আদিম শূন্যতার প্রতিচ্ছবিই নয়। এর ছিল ভয়ানক গাণিতিক ধর্মও। শূন্যের মধ্যে রয়েছে যুক্তির ভিত্তিকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার শক্তি।

গাণিতিক চিন্তার সূচনা ঘটেছিল ভেড়া গুণতে চাওয়ার ইচ্ছা থেকে। এছাড়াও সম্পদের হিসাব রাখতে ও সময় মাপতে গণিত লাগত। এগুলোর কোনোটাতেই শূন্যকে দরকার হয়নি। শূন্যের আবিষ্কারের আগেও হাজার বছর ধরে সভ্যতা ঠিকঠাক কাজ করছিল। শূন্যের পরটি ঘৃণা থেকে কিছু কিছু সংস্কৃতির মানুষ সংখ্যাটিকে বাদ দিয়েই বাঁচতে চেয়েছিল।

শূন্যবিহীন জীবন

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে শূন্যকে প্রয়োজন হয় না। কেউই শূন্যটি মাছ কিনতে যায় না। এক দিক থেকে সব অঙ্কবাচক সংখ্যার মধ্যে এটি সবচেয়ে সভ্য। চিন্তার পরিশীলিত রূপই আমাদেরকে সংখ্যাটি ব্যবহার করতে বাধ্য করেছে।

-আলফ্রেড নর্থ উইথহেড

একজন আধুনিক মানুষ শূণ্যবিহীন জীবনের কথা ভাবতেও পারেন না। ঠিক যেমনি ৭ বা ৩১ সংখ্যাগুলো ছাড়া জীবন চলা অসম্ভব। কিন্তু এক সময় শূন্য বলতে কোনো সংখ্যা ছিল না। ঠিক যেভাবে ছিল না ৭ বা ৩১। সেটা প্রাগৈতিহাসিক কালের কথা। তাই জীবাশ্মবিদরা পাথর ও হাড়ের টুকরো থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গণিতের জন্মকাহিনি বের করেছেন। এসব থেকে গবেষকরা জেনেছেন, প্রস্তর যুগের গণিতবিদরা এখনকার গণিতবিদদের চেয়ে অমার্জিত ছিলেন। ব্ল্যাকবোর্ডের বদলে তারা ব্যবহার করতেন নেকড়ে।

১৯৩০ এর দশকে প্রস্তর যুগের গণিতবিদদের সম্পর্কে বড় একটি তথ্য মেলে। প্রত্নতত্ত্ববিদ কার্ল আব্লোসম চেকোস্লোভাকিয়ার মাটি নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। তিনি এ সময় ৩০ হাজার বছরের পুরনো একটি নেকড়ের হাড় খুঁজে পান। তাতে রয়েছে অনেকগুলো খাঁজ কাটা। কেউ জানে না, গুহামানব গগ এই হাড় দিয়ে তার শিকার করা হরিণ, আঁকা ছবি বা তার গোসল না করা দিনগুলো গুনেছিল কি না। তবে এটা নিশ্চিত, প্রাচীন মানুষেরা কিছু না কিছু গুনেছিল।

প্রস্তর যুগে নেকড়ের একটি হাড়ই বর্তমান সময়ের একটি সুপারকম্পিউটার। গগের আদিপুরুষরা তো দুই পর্যন্তুও গুণতে পারত না। সেখানে শূন্যের দরকার হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। মনে হচ্ছে গণিতের একেবারে শুরুর দিকে মানুষ শুধু এক ও বহুর পার্থক্য বুঝত। একজন গুহামানবের বর্শা হয় একটা থাকত, নাহয় বহু। তিনি একটি টিকটিকি খেতেন, বা বহু। এক বা বহু ছাড়া অন্য রাশিকে বোঝানোর মতো কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। ধীরে ধীরে প্রাচীন ভাষাগুলো বিকশিত হলো। এক, দুই ও বহুর মধ্যে পার্থক্য পাওয়া গেল। শেষ পর্যন্ত এক, দুই, তিন ও বহুর পার্থক্যও জানা গেল। কিন্তু আরও বড় সংখ্যার কোনো নাম ছিল না। এই সমস্যা এখনও কিছু কিছু ভাষায় দেখা যায়। বলিভিয়ার সিরিয়না ইন্ডিয়ান বা ব্রাজিলের ইয়ানোয়ামাদের কথাই ধরুন। তাদের ভাষায় তিনের বেশি সংখ্যাকে প্রকাশ করার জন্য নেই কোনো শব্দ। তেমন দরকার হলে তারা বলেন “অনেক” বা “প্রচুর।”

কিন্তু সংখ্যার একটি দারুণ বৈশিষ্ট্যের কারণে সংখ্যাপদ্ধতি সেখানেই থেমে যায়নি। সংখ্যাদেরকে যোগ করে নতুন নতুন সংখ্যা পাওয়া যায়। তাই কিছুদিন পরেই বুদ্ধিমান মানুষগুলো সংখ্যা-শব্দগুলোকে বিভিন্ন সারিতে সাজাতে লাগল। বর্তমান ব্রাজিলের বাকাইরি ও বোরোরো জাতির মানুষের ব্যবহৃত ভাষায় এই কাজটি করা হয়েছে। তাদের সংখ্যাগুলো এ রকম: এক, দুই, দুই ও এক, দুই ও দুই, দুই ও দুই এবং এক ইত্যাদি। তারা দুইয়ের মাধ্মে হিসাব করে। গণিতবিদরা একে বলেন বাইনারি বা দ্বিমিক পদ্ধতি।

বাকাইরি বা বোরোরোদের মতো করে তেমন কেউ গণনা করেন না। প্রাচীন নেকড়ের হাড়ই প্রাচীনকালের গণনাপদ্ধতির আদর্শ উদাহরণ। গগের নেকড়ের হাড়ে ৫৫টি খাঁজ ছিল। প্রতি গ্রুপে ছিল ৫টি করে খাঁজ। প্রথম ২৫টি দাগের পরে দ্বিতীয় আরও একটি খাঁজ ছিল। মনে হচ্ছে, গগ হয়ত ৫ দিয়ে হিসাব করছিলেন। এবং গ্রুপগুলোকে ৫ দিয়ে গুচ্ছবদ্ধ করছিলেন। এটা করা খুবই অর্থবহ। দাগগুলোকে একটি একটি করে গণনা করার চেয়ে গ্রুপে গ্রুপে সাজিয়ে নিলে অনেক দ্রুত কাজ করা যায়। আধুনিক গণিতবিদরা বলবেন খোদাই শিল্পী গগ পাঁচভিত্তিক (quinary) গণনা পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন।

কিন্তু কেন পাঁচ-ই? গভীরে গিয়ে চিন্তা করলে বোঝা যাবে আসলে যেকোনো একটি সংখ্যা নিলেই চলত। গগ চারটি নিয়ে গুচ্ছ করে দাগ টানলে এবং চার ও ষোলো এর গুচ্ছ বানালেও তার সংখ্যাপদ্ধতি ঠিকই কাজ করত। একইভাবে কাজ করত ছয় ও ছত্রিশের গুচ্ছও। কয়টা নিয়ে গুচ্ছ করা হলো সেটার ওপর হাড়ের ওপর দাগের সংখ্যা নির্ভর করে না। কিন্তু গগ চারের বদলে ৫টি নিয়ে গুচ্ছ করেছেন। পৃথিবীর সব মানুষই গগের বৈশিষ্ট্যটা পেয়েছে। মানুষের প্রতি হাতে পাঁচটি করে আঙ্গুল আছে। ফলে বিভিন্ন সংস্কৃতির সংখ্যাপদ্ধতির ভিত্তি হিসেবে ৫কে জনপ্রিয় হতে দেখা গেল। যেমন, প্রাথমিক যুগের গ্রিকরা ট্যালি চিহ্ন আঁকাকে বলত “ফাইভিং।”

এমনকি দক্ষিণ আমেরিকার দ্বিমিক গণনা পদ্ধতিতেও ভাষাবিদরা পাঁচ ভিত্তিক সংখ্যাপদ্ধতির সূচনা দেখেছেন। বোরোরো ভাষায় “দুই ও দুই এবং এক” বলার আরেকটি উপায় হলো “এটা হলো আমার এই পুরো হাতের সমান।” বোঝাই যাচ্ছে, প্রাচীন আমলের মানুষ শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে গণনা করতে চাইত। পাঁচ (এক হাত), দশ (উভয় হাত) এবং বিশ (উভয় হাত ও উভয় পা) ছিল খুব পছন্দনীয় চিহ্ন। ইংরেজি ভাষার ইলেভেন (এগারো) ও টুয়েলভ (বারো) শব্দ দুটি মনে হচ্ছে “ওয়ান ওভার টেন” ও “টু ওভার টেন” থেকে এসেছে। আর তের (থার্টিন), চৌদ্দ (ফোর্টিন), পনের (ফিফটিন) ইত্যাদি হলো যথাক্রমে “থ্রি অ্যান্ড টেন”, “ফোর অ্যান্ড টেন” এবং “ফাইভ অ্যান্ড টেন” এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এ কারণে ভাষাবিদরা মনে করছেন, যে জার্মানীয় আদিভাষাসমূহ থেকে ইংরেজি ভাষা এসেছে সেগুলোতে দশ ছিল মৌলিক একক। এ কারণে সেই ভাষাগুলোর মানুষরাও ১০-ভিত্তিক সংখ্যাপদ্ধতি ব্যবহার করতেন। অন্য দিকে ফরাসি ভাষায় আশিকে বলে *কোয়াত্রে ভিংত* (চারটি বিশ)। আর নব্বইকে বলে *কোয়াত্রে ভিংত দি* (চারটি বিশ ও একটি দশ)। হয়ত এখনকার ফ্রান্সে যে মানুষগুলো বাস করতেন তারা ২০-ভিত্তিক বা ভিজেসিনাল সংখ্যাপদ্ধতি ব্যবহার করতেন। সাত ও ৩১-এর মতো সংখ্যাগুলো এই সবগুলো সংখ্যাপদ্ধতিতেই ছিল। হোক সেটা ৫-ভিত্তিক, ১০-ভিত্তিক, কিংবা ২০-ভিত্তিক। কিন্তু এগুলোর কোনোটিতেই ছিল না শূন্যের জন্যে কোনো নাম। এই ধারণাটারই অস্তিত্ব ছিল না।

শূন্যটি ভেড়ার যত্ন তো কখনও নিতে হয় না। কিংবা শুন্যসংখ্যক সন্তানের হিসাব রাখার দরকার হয় না। “আমার কাছে শূন্যটি কলা আছে” না বলে দোকানী বলেন, “আমার কাছে কোনো কলা নেই।” কোনো কিছুর অভাব বোঝানোর জন্যে আপনার সংখ্যার প্রয়োজন হয় না। আর কোনো বস্তুর অভাবকে প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করার বিষয়টিও কারও মাথায় আসেনি। এ কারণেই শূন্য ছাড়াই মানুষ এতগুলো সময় পার করে দিয়েছে। শূন্যের দরকারই পড়েনি। শূন্যের উদয় তাই ঘটেনি।

সত্যি বলতে, প্রাগৈতিহাসিক কালে সংখ্যার জ্ঞান ছিল বড় এক গুণ। গুনতে পারা ছিল দারুণ মেধার পরিচায়ক। একে জাদুমন্ত্রের মতোই অতীন্দ্রিয় ও গুপ্ত মনে করা হত। মিশরীয় বই *বুক অব ডেড*-এ আকেন নামে এক নৌকার মাঝি বিদেহী আত্মাকে নদী পার করে নরকে পৌঁছে দেয়। তিনি একবার একটি মৃত আত্মার মুখোমুখি হন। এ সময় তিনি “তার আঙ্গুলের সংখ্যা জানে না” এমন কাউকে নৌকায় নিতে অস্বীকার করেন। মাঝিকে সন্তুষ্ট করতে তখন আত্মাকে আঙ্গুলের সংখ্যা বের করতে একটি গণনার ছড়া আওড়াতে হয়। (অবশ্য গ্রিক গল্পে মাঝি চাইত টাকা, যা মৃত ব্যক্তির জিহ্বার নিচে বাঁধা থাকত)।

প্রাচীন পৃথিবীতে গুনতে পারত হাতে গোনা কিছু মানুষ। তবে সংখ্যা ও গণনার মৌলিক ধারণাগুলো সবসময় মানুষ আয়ত্ত করে লিখতে-পড়তে পারার আগেই। আগেকার যুগের সভ্যতার মানুষ যখন খাগড়া দিয়ে মাটির লিপিতে লিখতে, পাথরে খোদাই করে ছবি আঁকতে ও পশুচর্ম ও প্যাপাইরাসে কালি দিয়ে লিখতে শুরু করে, তত দিনে সংখ্যাপদ্ধতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। মৌখিক সংখ্যাপদ্ধতিকে লিখিত আকারে উপস্থাপন করা খুবই সহজ কাজ ছিল। দরকার শুধু একটি সাঙ্কেতিক পদ্ধতি। যার মাধ্যমে লেখকরা সংখ্যাকে আরও স্থায়ী রূপ দিতে পারে। (কিছু কিছু সমাজের মানুষ তো লেখালেখি শেখার আগেই এই কাজটি করে ফেলেছে। যেমন নিরক্ষর ইনকারা কুইপু নামে একটি পদ্ধতি ব্যবহার করত। এটা ছিল হিসাব করার জন্য বানানো একটি রঙিন ও গিঁট বাঁধা দড়ি।)

প্রথমদিকের লেখকদের লেখা সংখ্যাগুলোর সাথে তাদের সংখ্যাপদ্ধতির মিল থাকত। আর অনুমিতভাবেই তারা সেটা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত উপায়ে লিখত। গগের সময়ের পরে সমাজ জীবনে উন্নতি সাধিত হয়েছে। একের পর এক ছোট ছোট দাগের গুচ্ছ না বানিয়ে লেখকরা প্রতিটি গুচ্ছের জন্যে প্রতীক তৈরি করল। পাঁচ-ভিত্তিক সংখ্যাপদ্ধতিতে লেখক এক লেখার জন্যে হয়ত একটি দাগ দেবেন। পাঁচ এর একটি গুচ্ছ বোঝাতে আলাদা আরেকটি চিহ্ন ব্যবহার করবেন। ২৫ এর গুচ্ছ বোঝাতে ব্যবহার করবেন অন্য আরেকটি দাগ। এভাবেই চলবে।

মিশরীয়রা ঠিক এই কাজটিই করেছে। ৫ হাজার বছরেরও আগে, পিরামিডও তৈরির আগেই মিশরীয়রা তাদের দশমিক পদ্ধতিকে লেখায় রূপ দেওয়ার একটি নিয়ম তৈরি করে। সেখানে তারা ছবি দিয়ে সংখ্যা বোঝাত। একটি খাড়া দাগ দিয়ে এক একক বোঝানো হত। আবার গোড়ালির একটি হাড় দিয়ে বোঝানো হত ১০, একটি মোচড়ানো দড়ি ছিল ১০০ ইত্যাদি। এভাবে সংখ্যা লিখে যাওয়ার জন্যে তাদেরকে শুধু এই প্রতীকগুলোর গুচ্ছ রেকর্ড করতে হত। এক শ তেইশ বোঝানোর জন্যে ১২৩টি দাগ দেওয়ার বদলে লেখকরা ছয়টি প্রতীক লিখত। একটি রশি, দুটি গোড়ালি ও তিনটি খাড়া দাগ। প্রাচীনকালেই মূলত এভাবেই গাণিতিক কাজ হত। আর অন্য অনেক সভ্যতার মতোই মিশরেও শূন্য ছিল না। বা বলা যায়, প্রয়োজন হয়নি।

তবুও প্রাচীন মিশরীয়রা গণিতে ভালোই হাত পাকিয়েছিল। জ্যোতির্বিদ্যা ও সময় গণনায় তারা কারিশমা দেখিয়েছিল। তার মানে তাদেরকে উন্নত গণিত ব্যবহার করতে হয়েছিল। কারণ পঞ্জিকার পাতা খুব দ্রুত বদলে যায়।

বেশিরভাগ প্রাচীন মানুষের কাছেই একটি স্থিতিশীল পঞ্জিকা বানানো ছিল বড় এক সমস্যার কাজ। এর কারণ ছিল তারা সাধারণত চান্দ্র পঞ্জিকা দিয়ে কাজ শুরু করতেন। পরপর দুটি পূর্ণিমার মাঝের সময়টুকু ছিল এক মাস। এভাবে গণনা করাই ছিল সহজাত অভ্যাস। আকাশে চাঁদের বড়-ছোট হওয়া থেকে চোখ সরিয়ে রাখা ছিল কঠিন। আর সময়ের চক্র হিসাব করার জন্যে এ থেকে সুবিধাজনক একটি উপায়ও খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু চান্দ্র মাসের দৈর্ঘ্য হয় ২৯ থেকে ৩০ দিনের মাঝামাঝি। ১২টি মাস যোগ করে সব মিলিয়ে ৩৫৪ দিনের বেশি পাওয়া যায় না। যা সৌর বছরের চেয়ে ১১ দিন ছোট। তেরটি চান্দ্র মাস নিলে আবার ১৯ দিন বেশি হয়ে যায়। ওদিকে আবার চাষাবাদ নির্ভর করে সৌর বছরের ওপর, চান্দ্র বছর নয়। অসংশোধিত চান্দ্র মাস দিয়ে হিসাব করলে ঋতুর মাসগুলোকে বদলে যেতে দেখা যায়।

চান্দ্র মাসকে সংশোধন করাও আরেক মুশকিলের কাজ। সৌদি আরব ও ইসরায়েলসহ অনেকগুলো আধুনিক কালের দেশ এখনও পরিমার্জিত চান্দ্র পঞ্জিকা ব্যবহার করে। কিন্তু ৬ হাজার বছর আগে মিশরীয়রা আরও ভাল একটি সমাধান পেয়ে যায়। দিনের হিসাব রাখার তাদের পদ্ধতিটি ছিল অনেক সরল। সেই পঞ্জিকা ঋতুর সাথে মিল রেখে চলত অনেক দিন পর্যন্ত। সময়ের হিসাব রাখতে তারা চাঁদের বদলে সূর্যের ধারস্থ হয়। যেমনটা বর্তমানে বেশিরভাগ জাতি করেন।

চান্দ্র পঞ্জিকার মতোই তাদের মাস ছিল ১২টি। কিন্তু প্রতিটি মাস ছিল ৩০ দিনের। (১০-ভিত্তিক সংখ্যা ব্যবহার করায় তাদের এক সপ্তাহের দৈর্ঘ্য ছিল ১০ দিন। বছর শেষ হলে আরও বাড়তি পাঁচটি দিন যোগ করা হত। এতে করে সব মিলিয়ে ৩৬৫ দিন হয়ে যেত। এই পঞ্জিকাই আমাদের বর্তমান ক্যালেন্ডারের আদিরূপ। মিশরীয়দের এই পদ্ধতি গ্রিক ও পরে রোমানরা গ্রহণ করে। রোমানরা একে পরিমার্জন করে অধিবর্ষ যোগ করে। এটাই পরে পাশ্চাত্যে আদর্শ পঞ্জিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তবে মিশরীয়, গ্রিক ও রোমানদের কাছে শূন্যের ব্যবহার না থাকায় পশ্চিমা পঞ্জিকায়ও নেই শূন্য। এই অমনোযগই সহস্র বছর পরে সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মিশরীয়দের সৌর পঞ্জিকার উদ্ভাবন ছিল দারুণ এক অগ্রগতি। তবে ইতিহাসের পাতায় তারা আরও গুরত্বপূর্ণ একটি অবদানের স্বাক্ষরও রাখে। জ্যামিতির জ্ঞান। শূন্য ছাড়াই মিশরীয় অল্প সময়ের মধ্যেই গণিতের বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে। পাশেই একটি উত্তাল নদীর উপস্থিতিতে আসলে না হয়েও উপায় ছিল না। প্রতি বছর নীল নদের পানি উপচে পড়ে এর কূল ভাসিয়ে দিত। বদ্বীপে নেমে আসত বন্যা। একটি ভাল দিকও ছিল এর। উন্নত পলি এসে জমত কৃষি জমিতে। এর ফলে প্রাচীন পৃথিবীতে নীল বদ্বীপ হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে উর্বর কৃষিজমি। খারাপ দিকের মধ্যে ছিল সীমানার দাগ হারিয়ে যাওয়া। কৃষকরা বুঝতে পারতেন না কোনটা কার আবাদি জমি। মিশরে মালিকানাকে খুব গুরত্ব দেওয়া হত। মিশরীয় বই *বুক অব ডেড* পড়লে দেখা যায়, একজন মৃত মানুষকে ঈশ্বরের কাছে শপথ করে বলতে হয় যে সে প্রতারণা করে তার প্রতিবেশীর জমি দখল করেনি। এই পাপের শাস্তি ছিল এক ভয়ানক ভক্ষক প্রাণীকে পাপীর হৃদপিণ্ড খেতে দেওয়া। মিশরে চুরি করা ছিল শপথ ভাঙা, কাউকে হত্যা করা বা মন্দিরে স্বমৈথুনের মতোই কঠিন অপরাধ।

প্রাচীন ফেরাউনরা ক্ষয়ক্ষতি পরিমাপ ও নতুন করে সীমানা নির্দেশক স্থাপন করার জন্য জরিপ-আমিন নিয়োগ দিত। আর এভাবেই জন্ম জ্যামিতির। এই জরিপ-আমিন বা দড়ি প্রসারকরা (এটা বলা হত কারণ তারা পরিমাপের যন্ত্র ও গিঁট বাঁধা রশি দিয়ে সমকোণ বানাত) শেষ পর্যন্ত জমিকে আয়তক্ষেত্র ও ত্রিভুজে বিভক্ত করে ক্ষেত্রফল বের করার কায়দা বের করে। এছাড়া মিশরীয়রা পিরামিডের মতো বিভিন্ন বস্তুর আয়তন মাপার কৌশলও আয়ত্ত করে। পুরো ভূমধ্যসাগর এলাকায় মিশরীয় গণিত খ্যাতি অর্জন করেছিল। এবং সম্ভবত প্রাথমিক যুগের গ্রিক গণিতবিদরা, বিশেষ করে থ্যালিস ও পিথাগোরাসের মতো জ্যামিতিবিদরা মিশরে পড়াশোনা করেছিলেন। কিন্তু মিশরীয়দের এতসব দারুণ জ্যামিতিক কর্ম সত্ত্বেও মিশরের কোথাও শূন্যের অস্তিত্ব ছিল না।

এর বড় কারণ, মিশরীয়া ছিল কড়া বাস্তববাদী। আয়তন এবং দিন ও ঘণ্টা পরিমাপের বেশি কিছু তারা করতে পারেনি। প্রয়োগ নেই এমন কোনো কিছুতে গণিত তারা কাজে লাগাত না। ব্যতিক্রম হলো জ্যোতিষবিদ্যা (astrology)২। এ কারণে মিশরের সেরা গণতিবিদরাও বাস্তব জগতের সাথে অসম্পর্কিত কোনো গাণিতিক সমস্যায় জ্যামিতির মূলনীতিকে কাজে লাগাতে পারতেন না। তারা তাদের গাণিতিক ব্যবস্থাকে বিমূর্ত যুক্তির কাঠামোতে রূপ দিতে পারেনি। গণিতকে দর্শনে স্থান দিতেও তাদের কোনো উদ্যোগ ছিল না। গ্রিকরা আবার এমন ছিল না। বিমূর্ত ও দার্শনিক যুক্তিকে তারা সাদরে গ্রহণ করেছিল। প্রাচীন গণিতকে তারাই সর্বোচ্চ উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল। তবুও তারা শূন্য আবিষ্কার করতে পারেনি। শূন্যে এসেছে প্রাচ্য থেকে। পাশ্চাত্য থেকে নয়।

শূন্যের জন্ম

সংস্কৃতির ইতিহাসে শূন্যের আবিষ্কার মানুষের অন্যতম বড় অর্জন হিসেবে সবসময় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

-টোবিয়াস ড্যানজিগ , *নাম্বার: দ্য ল্যাংগুয়েজ অব সায়েন্স*

মিশরীয়দের চেয়ে গ্রিকরা গণিতটা ভাল বুঝত। মিশরীয়দের থেকে জ্যামিতি শিখে নিয়ে অল্প দিনের মাথায়ই গ্রিকরা গুরুদেরকে ছাড়িয়ে যায়। শুরুতে গ্রিকদের সংখ্যাপদ্ধতি মিশরীয়দের মতোই ছিল। গ্রিকদের একটি ১০-ভিত্তিক গণনাপদ্ধতিও ছিল। দুই সংস্কৃতির সংখ্যা লেখার পদ্ধতিতেও পার্থক্য ছিল খুব সামান্য। সংখ্যা বোঝাতে মিশরীয়দের মতো ছবি ব্যবহার না করে গ্রিকরা ব্যবহার করল অক্ষর। H(ইটা)৩ মানে *হেকাটন* বা ১০০। M (মিউ) মানে *মিরিওরি* বা ১০,০০০। ইংরেজিতে যাকে বলে মিরিয়াড (myriad)। গ্রিক পদ্ধতিতে এটাই ছিল সবচেয়ে বড় গুচ্ছ। পাঁচের জন্যেও তাদের একটি প্রতীক ছিল। যা থেকে বোঝা যাচ্ছে, তাদের পদ্ধতি ছিল পাঁচ ও দশ-ভিত্তিক পদ্ধতির মিশ্রণ। কিন্তু সার্বিকভাবে বেশ কিছু দিন পর্যন্ত মিশরীয় ও গ্রিকদের লেখার কায়দা ছিল প্রায় একই। তবে মিশরীয় একই জায়গায় থেকে গেলেও গ্রিকরা আদিম এই পদ্ধতির উন্নতি করে আরও আধুনিক কৌশল আবিষ্কার করে।

মিশরীয়দের মতো দুটি আঁচড় দিয়ে ২ বা তিনটা H লিখে ৩০০ না বুঝিয়ে নতুন পদ্ধতিতে গ্রিকরা ২, ৩ , ৩০০ ও আরও বহু সংখ্যার জন্য (চিত্র ১) আলাদা আলাদা অক্ষর ব্যবহার করল। এ পদ্ধতির প্রবর্তন ঘটে খৃষ্টপূর্ব ৫০০ সালের আগে। এ কৌশলের মাধ্যমে অক্ষরের পুনরাবৃত্তি ঠেকানো গেল। যেমন, ৮৭ লিখতে হলে মিশরীয় পদ্ধতিতে ১৫টি প্রতীক লাগত। আটটি গোড়ালি ও সাতটি খাড়া দাগ। গ্রিকদের নতুন পদ্ধতিতে সেখানে লেগেছে মাত্র দুটি প্রতীক। ৮০ এর জন্য Π এবং ৭ এর জন্য ζ। (রোমান পদ্ধতি এসে গ্রিক পদ্ধতিকে অপসারণ করে। কিন্তু রোমানদের পদ্ধতি এক ধাপ পেছনে গিয়ে মিশরীয়দের অনুন্নত পদ্ধতিই গ্রহণ করে। রোমান ৮৭, LXXXVIIলিখতে হলে সাতটি প্রতীক লাগে। অনেকগুলোই একাধিকবার এসেছে।)

গ্রিকদের পদ্ধতি মিশরীয়দের চেয়ে উন্নত হলেও প্রাচীনকালে লেখালেখির সবচেয়ে উন্নত কৌশল নয়। এ মর্যাদা পাবে প্রাচ্যের আরেকটি উদ্ভাবন। গণনার ব্যাবিলনীয় কৌশল। আর তাদের পদ্ধতির কারণেই শেষ পর্যন্ত প্রাচ্যে শূন্যের উদয় ঘটে। বর্তমান ইরাকের ফার্টাইল ক্রিসেন্ট অঞ্চলে।

প্রথমে দেখে ব্যাবিলনীয় পদ্ধতিকে এলোমেলো মনে হবে। প্রথমত, এটা হলো ৬০-ভিত্তিক পদ্ধতি। দেখতে-শুনতে খুবই অদ্ভুত ঠেকে। কারণ বেশিরভাগ সমাজেই তো ৫, ১০ বা ২০ ছিল ভিত্তি সংখ্যা। এছাড়া ব্যাবিলনীয়রা তাদের সংখ্যাগুলো প্রকাশ করতে মাত্র দুটি দাগ ব্যবহার করত। একটি কীলক দিয়ে ১ ও একটি ডাবল কীলক দিয়ে ১০। এই দাগ দুটিকে গুচ্ছ গুচ্ছ করে সাজানো হত। যোগফল হত ৫৯ বা তার কম। এই গুচ্ছগুলোই ছিল গণনার মৌলিক প্রতীক। ঠিক যেভাবে গ্রিকদের ছিল অক্ষর আর মিশরীয়দের ছিল ছবি। কিন্তু ব্যাবিলনীয় পদ্ধতির অদ্ভুত দিক এটি নয়। মিশরীয় ও গ্রিকদের যেখানে প্রতিটি প্রতীক দিয়ে আলাদা আলাদা সংখ্যা বোঝানো হত, সেখানে ব্যাবিলনীয়দের প্রতিটি প্রতীক দিয়ে অনেকগুলো আলাদা আলাদা সংখ্যা বোঝানো যেত। একটিমাত্র কীলক দিয়ে ১, ৬০, ৩৬০০ বা অন্য আরও অগণিত সংখ্যা প্রকাশ করা হত।

চিত্র ১

বিভিন্ন সংস্কৃতির সংখ্যা

আধুনিক চোখ এটা দেখে অবাক লাগলেও প্রাচীন মানুষের কাছে এটি ছিল খুবই অর্থবহ। এটা বলা যায় ব্রোঞ্জ যুগের কম্পিউটার কোড। অন্য অনেক সংস্কৃতির মতোই ব্যাবিলনীয়রাও গণনার কাজে সহায়তা করা যন্ত্র আবিষ্কার করেছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত যন্ত্র হলো অ্যাবাকাস। যন্ত্রটা জাপানে *সরোবান*, চীনে *সুয়ান-পান*, রাশিয়ায় *স্কটি*, তুরস্কে *কুলবা*, আর্মেনিয়ায় *কোলেব* এবং অন্যান্য সংস্কৃতি আরও নানান নামে পরিচিত ছিল। অ্যাবাকাসে পিছলানো পাথর ব্যবহার করে সংখ্যার পরিমাণের হিসাব রাখা হত। (ক্যালকুলেট বা হিসাব করা, ক্যালকুলাস ও ক্যালসিয়াম সবগুলো শব্দই নুড়ি শব্দের ল্যাটিন রূপ *ক্যালকুলাস* থেকে আসা। )

পাথরকে উপরে-নীচে নড়াচড়া করেই যোগ করে ফেলা যেত অ্যাবাকাসে। ভিন্ন স্তম্ভের (কলাম) পাথরের সাংখ্যিক মান ছিল ভিন্ন। এগুলোকে নাড়িয়ে দক্ষ ব্যবহারকারী বড় বড় সংখ্যা খুব দ্রুত যোগ করা যেত। হিসাব শেষ হলে ব্যবহারকারীকে শুধু পাথরের সর্বশেষ অবস্থানের দিকে টাকাতে হত। এবার সেগুলোকে সংখ্যায় রূপান্তর করে নিলেই কেল্লাফতে!

ব্যাবিলনীয়দের সংখ্যা নিয়ে কাজ করার পদ্ধতিটি মাটির ফলকে অ্যাবাকাসকে প্রতীক দিয়ে লিখে ফেলার মতো। প্রতীকের প্রতিটি গুচ্ছ দিয়ে যে নির্দিষ্টসংখ্যক পাথর অ্যাবাকাসে নাড়ানো হয়েছে তা বোঝানো হত। আর অ্যাবাকাসের প্রতিটি কলামের মতোই অবস্থানের ওপর নির্ভর করে প্রতিটি গুচ্ছের আলাদা আলাদা সাংখ্যিক মান ছিল। এই দিক থেকে আমরা এখন যে পদ্ধতি ব্যবহার করি তা থেকে ব্যাবিলনীয় পদ্ধতি খুব আলাদা ছিল না। ১১১ এর প্রতিটি ১ এর মান ভিন্ন। ডান থেকে তাদের মান যথাক্রমে এক, দশ ও একশ। একইভাবে ^^^ এর তিনটি আলাদা অবস্থানে ^ এর মানে যথাক্রমে এক, ষাট ও ছত্রিশ শ। একটি সমস্যা বাদ দিলে এটাও ঠিক অ্যাবাকাসের মতোই ছিল। ব্যাবিলনীয়রা ৬০ লিখত কীভাবে? ১ লেখা তো সহজ। একটি কীলক (^)। দূর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো ৬০ ও লেখা হত এভাবেই। একমাত্র পার্থক্য হলো প্রথম অবস্থানের বদলে ^ থাকত দ্বিতীয় অবস্থানে। অ্যাবাকাস দিয়ে বোঝা যেত কোন সংখ্যাটি বোঝানো হচ্ছে। একটিমাত্র পাথর প্রথম কলামে আছে না দ্বিতীয় কলাম আছে তা তো দেখে সহজেই বোঝাই যায়। কিন্তু লিখতে গেলে? একটি লিখিত প্রতীক কোন কলামে ছিল তা লিখে বোঝানোর জন্যে ব্যাবিলনীয়দের কোনো পদ্ধতি ছিল না। ^ এর অর্থ হতে পারত ১, ৬০ বা ৩৬০০। সংখ্যাগুলো মিশ্রিত হলে ব্যাপারটা আরও খারাপ হয়ে দাঁড়ায়। ^^ এর অর্থ হতে পারে ৬১, ৩৬০১ বা ৩৬৬০ বা আরও বড় কিছু।

এ সমস্যার সমাধান হলো শূন্য। খৃষ্টপূর্ব প্রায় ৩০০ সালের দিকে ব্যাবিলনীয়রা অ্যাবাকাসের খালি কলাম বা ফাঁকা স্থান বোঝাতে বাঁকানো কীলক (<) ব্যবহার করতে শুরু করে। এর মাধ্যমে বোঝা যেত একটি প্রতীক কোন অবস্থানে আছে। শূন্য আসার আগে ^^ কে ৬১ও বলা যেত, ৩৬০১ ও বলা যেত। কিন্তু শূন্য আসার পরে ^^ দিয়ে বোঝাল ৬১ আর ৩৬০১ লেখা হত ^<^।(চিত্র ২)। ব্যাবিলনীয় অঙ্কের নির্দিষ্ট ক্রমকে অনন্য ও স্থায়ী অর্থ প্রদান করতে শূন্যের জন্ম হয়। শূন্য খুব কাজে আসল। কিন্তু এর ছিল শুধুই স্থানীয় অবস্থান। অ্যাবাকাসের ফাঁকা স্থান ব্যবহার করার জন্যই শুধু একে ব্যবহার করা হলো। অ্যাবাকাসের যে কলামে সবগুলো পাথর নীচে পড়ে থাকত সে কলামের জন্যে। অন্য অঙ্কগুলোকে সঠিক জায়গায় বসানো নিশ্চিত করার চেয়ে তেমন বেশি কোনো ছিল না শূন্যের। এর নিজস্ব কোনো সাংখ্যিক মান ছিল না। আর যাই হোক, ০০,০০,২১,৪৮ আর ২১৪৮ তো একই সংখ্যাই। এক গুচ্ছ অঙ্কের মধ্যে শূন্যের বাঁয়ে কোনো অঙ্ক থাকলে তবেই শূন্য অর্থবহ হয়। এর নিজস্ব বলতে আছে ... শূন্য। শূন্য ছিল একটি অঙ্ক, সংখ্যা নয়। এর কোনো মান ছিল না।

চিত্র ২

ব্যাবিলনীয় সংখ্যা

একটি সংখ্যার মান পাওয়া যায় সংখ্যারেখায় এর অবস্থান থেকে। অন্য সংখ্যাদের সাপেক্ষে এর অবস্থান তুলনা করে। যেমন, ২ সংখ্যাটি আসে ৩ এর আগে এবং ১ এর পরে। অন্য কোথাও এর কোনো অর্থ থাকবে না। কিন্তু সংখ্যারেখায় শূন্যটি দাগের জন্য শুরুতে কোনো অবস্থান ছিল না। এটা ছিল শুধু একটি প্রতীক। সংখ্যাদের ক্রমবিন্যাসে এর জন্যে কোনো স্থান ছিল না। এমনকি এখনও আমরা শূন্যকে অনেকসময় অসংখ্যা হিসেবে বিবেচনা করি। যদিও আমরা সবাই জানি, শূন্যের আছে একটি সাংখ্যিক মানও। শূন্যের সাংখ্যিক মান না বুঝিয়েও একে স্থান নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করি। টেলিফোন বা কম্পিউটার কিবোর্ডের দিকেই তাকিয়ে দেখুন না। ০ আছে ৯ এর পরে। ১ এর আগে নয়, যেখানে এর থাকার কথা। স্থান নির্দেশক ০ কোথায় বসল তাতে কিছু আসে যায় না। সংখ্যার ক্রমবিন্যাসে এটি যেকোনো জায়গায়ই বসতে পারে। কিন্তু এখন সবাই জানে, শূন্য আসলে সংখ্যারেখার যেকোনো এক জায়গায় বসলে হবে না। কারণ এর নিজস্ব একটি নির্দিষ্ট সাংখ্যিক মান আছে। এটিই ধনাত্মক ও ঋণাত্মক সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য করে। এটি একটি জোড় সংখ্যা। আর এটি ১ এর আগের পূর্ণ সংখ্যা। সংখ্যারেখায় শূন্যকে এর উপযুক্ত জায়গায় স্থান দিতে হবে। ১ এর আগে এবং ঋণাত্মক ১ এর পরে। অন্য কোথাও সংখ্যাটি অর্থপূর্ণ হয় না। তবুও কম্পিউটারে শূন্যের অবস্থান সবার শেষে। আর টেলিফোনে সবার নীচে। কারণ আমরা গুণতে শুরু করি ১ থেকে।

দেখে মনে হয় গণনা শুরুর জন্যে এক-ই উপযুক্ত সংখ্যা। কিন্তু সেটা করলে শূন্য চলে যাচ্ছে অস্বাভাবিক এক জায়গায়। মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকার মায়ান জাতিসহ বিভিন্ন সংস্কৃতিতে এক দিয়ে শুরু করাকে স্বাভাবিক মনে করা হত না। মায়ানদেও একটি সংখ্যাপদ্ধতি ও পঞ্জিকা ছিল। সেটি আমাদের পদ্ধতির চেয়েও বেশি অর্থবহ ছিল। ব্যাবিলনীয়দের মতোই মায়ানদের ছিল অঙ্ক ও স্থানের স্থানীয় মান পদ্ধতি। একমাত্র পার্থক্য হলো, যেখানে ব্যাবিলনীয়দের সংখ্যার ভিত্তি ছিল ৬০, মায়ানদের সেখানে ভিত্তি ছিল ২০। তারও আগে প্রচলিত ১০-ভিত্তিক সংখ্যাপদ্ধতির ধারণা এতে কাজে লাগানো হয়েছিল। ব্যাবিলনীয়দের মতোই তাদেরও প্রতীত অঙ্কের অর্থ খেয়াল রাখার জন্যে একটি শূন্যের দরকার পড়েছিল। আরও মজার ব্যাপার হলো, মায়ানদের দুই ধরনের অঙ্ক ছিল। সরল রূপে ছিল শুধু বিন্দু আর রেখা। আর জটিল রূপটি বানানো হয়েছিল অদ্ভুতদর্শন মুখাবয়বের গ্লিফ (glyph)দিয়ে। আধুনিক চোখে আপনার কাছে মায়ানদের লিখিত গ্লিফকে ভিনগ্রহের প্রাণীর মুখের মতোই মনে হবে (চিত্র ৩)।

মিশরীয়দের মতো মায়ানদেরও দারুণ একটি সৌর পঞ্জিকা ছিল। গণনাপদ্ধতি ২০-ভিত্তিক হওয়াতে স্বাভাবিকভাবেই তারা বছরকে ২০ দিন মেয়াদের ১৮টি মাসে বিভক্ত করেছিল। যোগ করলে যা হয় ৩৬০ দিন। বছর শেষে উয়ায়েব নামে বিশেষ পাঁচটি দিন যোগ করে ৩৬৫ বানানো হত। কিন্তু মিশরীয়দের না থাকলেও মায়ানদের গণনাপদ্ধতিতে একটি শূন্য ছিল। ফলে তারা যা করার তাই করল। তারা শূন্য থেকে দিনের হিসাব করা শুরু করল। জিপ মাসের প্রথম দিনকে বলা হত জিপের ইন্সটলেশন বা সংস্থাপন। পরের দিনকে বলা হত ১ জিপ। তার পরে ২ জিপ। এভাবেই চলত ১৯ জিপ পর্যন্ত। পরের দিনকে বলা হত জৎয বা ০ জৎযের সংস্থাপন। এর পরে আসত ১ জৎয, ২ জৎয ইত্যাদি। প্রতি মাসে ছিল ২০টি দিন। যাদেরকে ০ থেকে ১৯ পর্যন্ত সূচিত করা হত। এখন আমরা যেভাবে লিখি তেমন ১ থেকে ২০ নয়। (মায়ান পঞ্জিকা বিস্ময়কর রকম জটিল ছিল। এই সৌর পঞ্জিকার সাথে একটি অনুষ্ঠানধর্মী পঞ্জিকাও ছিল। এতে ছিল ২০টি সপ্তাহ। প্রতি সপ্তাহে ১৩ দিন। সৌর বছরের সাথে সমন্বিতভাবে এই পঞ্জিকাটি একটি চক্র তৈরি করে। ৫২-বছর দীর্ঘ এই চক্রের পতি দিনের জন্যে ছিল আলাদা আলাদা নাম।)

চিত্র ৩

মায়ান সংখ্যা

বর্তমান পাশ্চাত্য ব্যবস্থার চেয়ে মায়ান পদ্ধতি বেশি অর্থপূর্ণ ছিল। পাশ্চ্যাত্যে পঞ্জিকা তৈরির সময় শূন্য ছিল না। এ কারণে আমরা শূন্য দিন বা শূন্য বছর দেখি না। আপাতদৃষ্টিতে শূন্যকে বাদ দেওয়ার কোনো উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া আছে বলে মনে করা হয় না। অথচ এর ফলেই কিন্তু অনেক সমস্যা হয়েছে। শূন্য না থাকার কারণে সহস্রাব্দের সূচনা নিয়ে বিতর্ক বাঁধে। একবিংশ শতকের প্রথম বছর কি ২০০০ নাকি ২০০১ তা নিয়ে মায়ানদের বিতর্ক করা লাগত না। কিন্তু আমাদের পঞ্জিকার সূচনা মায়ানরা করেনি। করেছে মিশরীয়রা ও পরে রোমানরা। এ কারণে আমরা সমস্যাময় শূন্যবিহীন পঞ্জিকায় আটকে আছি।

মিশরীয় সভ্যতায় শূন্য না থাকার ব্যাপারটা পঞ্জিকা ও ভবিষ্যৎ পাশ্চাত্য গণিতের জন্য খারাপ ফল বয়ে আনে। আসলে গণিতের জন্যে মিশরীয় সভ্যতা একের বেশি উপায়ে নেতিবাচক। শুধু শূন্যের অভাবই ভবিষ্যতের জন্যে সমস্যা তৈরি করেনি। ভগ্নাংশ নিয়েও কাজ করার ভাল কোনো উয়াপ্য তারা বের করতে পারেনি। এখন আমরা ৩/৪ কে যেমন চারভাগের তিন ভাগ মনে করি তারা সেভাবে দেখত না। তারা একে নিছক ১/২ ও ১/৪ এর যোগফল হিসেবে দেখত। ২/৩ ছাড়া সব ভগ্নাংশকে মিশরে 1/n আকারে সংখ্যার যোগফল আকারে লেখা হত। (যেখানে n একটি গণনাসংখ্যা বা স্বাভাবিক সংখ্যা, মানে ১, ২, ৩, ... ইত্যাদি)। 1/n কে বলা হত তথাকথিত একক ভগ্নাংশ। এই একক ভগ্নাংশদের বিশাল সারির কারণে মিশরীয় (ও গ্রিক) সংখ্যাপদ্ধতিতে অনুপাত নিয়ে কাজ করা ছিল দারুণ কঠিন এক কাজ।

এই অসুবিধাজনক পদ্ধতি শূন্য আসার পর পুরনো হয়ে গেল। ব্যাবিলনীয় পদ্ধতিতে শূন্য ছিল। ফলে ভগ্নাংশ লেখা সহজ হয়ে গেল। আমরা ১/২ কে ঠিক যেভাবে ০.৫ লিখতে পারি বা ৩/৪ কে ০.৭৫, একইভাবে ব্যাবিলনীয়রা ১/২কে লিখত ০;৩০, ৩/৪কে লিখত ০;৪৫। (আসলে ভগ্নাংশ নিয়ে কাজ করতে ব্যাবিলনীয়দের ৬৯-ভিত্তিক পদ্ধতি আমাদের আধুনিক ১০-ভিত্তিক পদ্ধতির চেয়ে বেশি সুবিধাজনক।)

দূর্ভাগ্যের বিষয় হলো, রোমান ও গ্রিকরা শূন্যকে ঘৃণা করত। সে ঘৃণা এতটাই যে তারা ব্যাবিলনীয়দের পদ্ধতিতে না গিয়ে মিশরীয়দের প্রতীকে পড়ে রইল। যদিও ব্যাবিলনীয় পদ্ধতি ছিল সহজ। জ্যোতির্বিদ্যার সারণি বানানসহ নানান কাজে জটিল হিসেব-নিকেশ করা দরকার হয়। গ্রিক পদ্ধতি এতই জটিল ছিল যে গণিতবিদরা একক ভগ্নাংশগুলোকে ব্যাবিলনীয় ৬০-ভিত্তিক সংখ্যায় রূপান্তর করত। তারপর হিসেব শেষ করে প্রাপ্ত সংখ্যাকে আবার গ্রিক রূপ দান করত। চাইলেই তারা অনেক সময় বাঁচাতে পারত। (ভগ্নাগশকে বারবার রূপান্তর করতে কেমন মজা তা সবাই জানি) কিন্তু গ্রিকরা শূন্যকে এতই ঘৃণা করতে যে তারা একে তাদের সংখ্যাপদ্ধতিতে স্থান দিতে অস্বীকার করে। যদিও সুবিধা সম্পর্কে জানত। কারণ হলো, শূন্য ছিল ভয়ানক।

শূন্যের ভয়ানক বৈশিষ্ট্য

সবচেয়ে আগের সময়ে বাস করত ইমির। ছিল না জল বা স্থল। বা কোনো নোনা তরঙ্গ। ছিল না নভোমণ্ডল বা ভূমণ্ডল। ছিল শুধু হাঁ করে থাকা শূন্যতা। কোথাও ছিল না সবুজের বিস্তার।

-দ্য এলডার এডা

সংখ্যাকে আবার মানুষ ভয়! এটা কল্পনা করাও কঠিন। তবুও শূন্যতা বা অনস্তিত্বের সাথে শূন্যকে জোর করে জড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। শূন্যতা ও বিশৃঙ্খলা ছিল ভয়ের বড় একটি কারণ। শূন্য নিয়েও ছিল ভয়।

বেশিরভাগ প্রাচীন মানুষ মনে করত, মহাবিশ্বের জন্মের আগে ছিল শুধু শূন্যতা ও বিশৃঙ্খলা। গ্রিকরা বলত, শুরুতে অন্ধকার ছিল সবকিছুর জনক। অন্ধকার থেকে এল বিশৃঙ্খলা। অন্ধকার ও বিশৃঙ্খলা থেকে জন্ম হয় বাকি সব সৃষ্টির। হিব্রু সৃষ্টি পুরাণে আছে, ঈশ্বর আলো ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করার আগে পৃথিবী ছিল বিশৃঙ্খল ও ফাঁকা। (হিব্রু কথাটি হলো *তোহু ভ বহু।* রবার্ট গ্রেভসের মতে এই *তোহু* শব্দের সাথে *তেহমত* শব্দটি জড়িত। তেহমত হলো একটি সেমেটীয় ড্রাগন, যা মহাবিশ্বের জন্মের সময় উপস্থিত ছিল। এর দেহ থেকে আসে পৃথিবী ও আকাশ। আর *বহু*র সাথে সম্পর্ক ছিল *বেহমত*-এর, যা হলো হিব্রু রূপকথার বিখ্যাত দানব।)প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্যে একজন স্রষ্টার কথা বলা হয় যিনি বিশৃঙ্খলার মাখনকে মন্থন করে পৃথিবী সৃষ্টি করেন। নর্স পুরাণে আছে একটি উন্মুক্ত শূন্যতার কথা, যা বরফ দিয়ে আবৃত হয়। আর আগুন ও বরফের মিশ্রণ থেকে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা থেকে জন্ম হয় আদি দানবের। মহাবিশ্বের আদিম ও সহজাত অবস্থা ছিল শূন্য ও বিশৃঙ্খল। সময়ের সমাপ্তিতে শূন্যতা ও বিশৃঙ্খলা আবার ফিরে আসার ভয় সবসময় তাড়া করে ফিরত। শূন্য ছিল সেই শূন্যতারই প্রতিচ্ছবি।

কিন্তু শূন্যের ভয় শূন্যতা নিয়ে অস্বস্তির চেয়ে বেশি হয়ে গেল। প্রাচীন মানুষের কাছে শূন্যের গাণিতিক বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল ব্যাখ্যার অতীত। যেমনিভাবে মহাবিশ্বের জন্ম ছিল রহস্যের চাদরে ঢাকা। এর কারণ শূন্য অন্য সংখ্যা থেকে আলাদা। ব্যাবিলনীয় পদ্ধতির অন্য সংখ্যার মতো শূন্যের কখনও নিজস্ব মর্যাদা ছিল না। এর কারণটাও যথাযথ ছিল। নিঃসঙ্গ শূন্যের আচরণ ভাল নয়। কম করে বললেও, এটি অন্য সংখ্যার মতো আচরণ করে না।

একটি সংখ্যাকে নিজের সাথে যোগ করুন। এটি পাল্টে যাবে। একের সাথে এক যোগ করলে এক হয় না। হয় দুই। দুইয়ের সাথে দুই যোগ করলে হয় চার। কিন্তু শূন্যের সাথে শূন্য যোগ করলে শূন্যই থাকে। এটি আর্কিমিডিসের উপপাদ্য মেনে চলে না, যা সংখ্যার মৌলিক একটি নীতিমালা। উপপাদ্যটি বলছে, কোনো কিছুকে যথেষ্টসংখ্যক বার নিজের সাথে যোগ করলে এটি মানের দিক দিয়ে সকল সংখ্যার চেয়ে বড় হয়ে যাবে। (আর্কিমিডিসের উপপাদ্যকে প্রকাশ করা হয়েছিল ক্ষেত্রফলের মাধ্যমে। দুটো অসমান ক্ষেত্রফলের পার্থক্যকে একটি সংখ্যা মনে করা হত) কিন্তু শূন্য তো কখনও বড় হয় না। এটি অন্য সংখ্যাকেও বড় করতে পারে না। দুই ও শূন্য যোগ করলে শূন্যই থাকে। যেন আপনি সংখ্যার যোগ করাকেই থোড়াই কেয়ার করছেন। বিয়োগ করলেও ঘটে একই কাণ্ড। দুই থেকে শূন্য বিয়োগ করলেও দুই-ই পাচ্ছেন। শূন্যের যেন কোন দাম নেই। তবু এই দামহীন সংখ্যাই গুণ ও ভাগের মতো গণিতের সবচেয়ে সরল কাজগুলোকে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়।

সংখ্যার জগতে গুণ হলো এক ধরনের প্রসারণ। আক্ষরিক অর্থেই বলছি। মনে করুন, সংখ্যারেখা হলো একটি রবারের ফিতা। যার গায়ে বিভিন্ন দাগ দেওয়া আছে। (চিত্র ৪) দুই দিয়ে গুণ করা মানে ফিতাকে দুই গুণ প্রসারিত করা। আগে যে দাগটি এক ছিল, এখন সেটি দুই। আগে যে দাগটি তিন নম্বর অবস্থানে ছিল, এখন তার অবস্থান ছয়। একইভাবে একর অর্ধেক দিয়ে গুণ করা মানে ফিতাটাকে একটু শিথিল করা। আগে যে দাগটি ছিল দুই নং অবস্থানে, এখন সেটি আছে এক নং অবস্থানে। আগে যে দাগটি ছিল তিনে, এখন সেটি আছে দেড়ে। কিন্তু শূন্য দিয়ে গুণ করলে কী হবে?

চিত্র ৪

রবারের গুণের ফিতা

যেকোনো কিছুকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে শূন্য হয়। ফলে সবগুলো দাগ চলে আসে শূন্যতে।

রবারের ফিতা শেষ। পুরো সংখ্যারেখাই শেষ।

দূর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, এই অপ্রিয় সত্যকে এড়ানোর কোনো উপায় নেই। যেকোনো কিছুকে শূন্য দিয়ে গুণ করলেই শূন্য হয়। এটা আমাদের সংখ্যাপদ্ধতির একটি নিয়ম। দৈনন্দিন সংখ্যাগুলোকে অর্থবহ হতে হলে তার বণ্টন বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা সবচেয়ে ভাল বোঝা যাবে। ধরুন, একটি খেলনার দোকানে বল বিক্রি করা হয় দুটি করে আর ইট বিক্রি করা হয় তিনটি করে। পাশের খেলনার দোকানে বিক্রি হয় দুটি বল ও তিনটি ইটের মিশ্রিত প্যাক। এক ব্যাগ বল ও এক ব্যাগ ইট মিলে যা হয়, পাশের দোকানটির একটি মিশ্রণ প্যাকও তাই হয়। ব্যাপারটা ঠিক থাকবে যদি এক দোকানের সাত ব্যাগ বল ও সাত ব্যাগ ইট পাশের দোকান থেকে কেনা মিশ্রণ প্যাকের সাতটির সমান হয়। এটাই বণ্টন ধর্ম। গাণিতিকভাবে আমরা বলি, ৭ × ২ + ৭ × ৩ = ৭ × (২+৩)। সবকিছু ঠিক আছে।

এই বৈশিষ্ট্য শূন্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গেলে অদ্ভুত ফল মিলবে। আমরা জানি, ০ + ০ = ০। তাহলে একটি সংখ্যাকে ০ দিয়ে গুণ করা আর (০ +০) দিয়ে গুণ করা একই হবে। উদাহরণ দেখা যাক। ২ × ০ = ২ (০ + ০)। কিন্তু বণ্টন ধর্ম বলছে, ২ (০ + ০) আর ২ × ০ + ২ × ০ একই জিনিস। কিন্তু এর অর্থ হবে ২ × ০ = ২ × ০ + ২ × ০। ২ × ০ এর মান যাই হোক, একে এর সাথে যোগ করলে আগের মানই থাকে। একে অনেকটা শূন্যের মতোই মনে হয়। আসলেও এটি তাই। সমীকরণের দুই পাশ থেকে ২ × ০ বিয়োগ করলে আমরা দেখি ০ = ২ × ০। অতএব, আপনি যাই করেন না কেন, একটি সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে শূন্যই মিলবে। এই বিরক্তিকর সংখ্যাটা সংখ্যারেখাকে দুমড়ে-মুচড়ে বিন্দু বানিয়ে দেয়। তবে এই বৈশিষ্ট্য বিরক্তিকর হলেও শূন্যের আসল ক্ষমতা টের পাওয়া যায় গুণের বদলে ভাগ দিতে গেলে।

ঠিক যেভাবে গুণ সংখ্যারেখাকে প্রসারিত করে, তেমনি ভাগ করে সঙ্কুচিত। দুই দিয়ে গুণ করলে সংখায়রেখা দুই গুণ প্রসারিত হবে। দুই দিয়ে ভাগ করলে সংখ্যারেখার রবারের ফিতা দুই গুণ শিথিল হবে। গুণের প্রভাব বাতিল হয়ে যাবে। ভাগ করলেই গুণের প্রভাব চলে যায়। সংখ্যারেখায় প্রসারিত হওয়া দাগ চলে আসবে এর আগের জায়গায়।

শূন্য দিয়ে গুণ করলে কি হতে পারে তা আমরা দেখেছি। সংখ্যারেখার বিলুপ্তি ঘটে। শূন্য দিয়ে ভাগ হওয়া উচিত শূন্য দিয়ে গুণের বিপরীত। ধ্বংস হওয়া সংখ্যারেখাকে এর ফিরিয়ে আনা উচিত। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনকভাবে সেটা হয় না।

আগের উদাহরণে আমরা দেখলাম, ২ × ০ এর মান ০। অতএব, আগের অবস্থায় যেতে হলে আমাদেরকে ধরে নিতে হবে, (২ × ০)কে ০ দিয়ে ভাগ দিলে ২ ফেরত পাওয়া যাবে। একইভাবে (৩ × ০) কে ০ দিয়ে ভাগ দিলে ৩ পাওয়ার কথা। (৪ × ০) কে ০ দিয়ে ভাগ দিলে ৪ পাওয়ার কথা। কিন্তু আমার তো দেখলামই, ২ × ০, ৩ × ০ ও ৪ × ০ এর প্রতিটির মান ০। অতএব, (২ × ০)/০ এর মান ০/০, (৩ × ০)/০ এর মানও ০/০। একই মান (৪ × ০) এরও। কিন্তু হায়! এর মানে দাঁড়ায়, ০/০ হলো ২ এর সমান। শুধু তাই নয়, এটা ৩ এরও সমান। ৪ এরও। এর কোনো অর্থই হয় না।

১/০ এর দিকে একটি ভিন্নভাবে তাকালেও অদ্ভুত জিনিসের দেখা মেলে। গুণ করলে ভাগের প্রভাব দূর হওয়ার কথা। ফলে ১/০ এর মান হওয়ার কথা ১। কিন্তু আমরা তো দেখলামই, যেকোনো কিছুকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে শূন্যই পাওয়া যায়। এমন কোনো সংখ্যা নেই, যাকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে ১ হবে। অন্তত আমরা এখন পর্যন্ত এমন কোনো সংখ্যা দেখিনি।

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কথা হলো, জোর করে শূন্য দিয়ে ভাগ দিতে গেলে যুক্তি ও গণিতের পুরো ভিত্তিই ধ্বংস হয়ে যাবে। শূন্য দিয়ে একবার, মাত্র একবার, ভাগ দিয়েই আপনি মহাবিশ্বের সবকিছু গাণিতিকভাবে প্রমাণ করতে পারবেন। আপনি প্রমাণ করতে পারবেন ১ + ১ = ৪২। এটা থেকে আপনি প্রমাণ করতে পারবেন এরশাদ ছিলেন ভিনগ্রহের একজন বাসিন্দা, কাঁজি নজরুল ইসলাম জন্মেছিলেন উজবেকিস্তানে। অথবা আকাশ ফোঁটার নকশায় পরিপূর্ণ। (উইনস্টন চার্চিল যে একটি গাজর ছিল তা দেখতে পরিশিষ্ট ক পড়ুন।)

শূন্য দিয়ে গুণে ধ্বংস হয় সংখ্যারেখা। কিন্তু শূন্য দিয়ে ভাগ দিলে ধ্বংস হয় পুরো গাণতিক কাঠামো।

এই একটি সরল সংখ্যার অনেক ক্ষমতা। গণিতে সংখ্যাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শূন্যের অদ্ভুত গাণিতিক ও দার্শনিক বৈশিষ্ট্যের কারণে পাশ্চ্যাত্যের মৌলিক দর্শনের সাথে এর মিল হয়নি।

অনুবাদকের নোট

১। ফার্টাইল ক্রিসেন্টঅঞ্চলটি মধ্যপ্রাচ্যের অন্তর্গত ইরাক, সিরিয়া, ইসরায়েল, ফিলিস্তিন, জর্দান, মিশরের নীলনদ এলাকা ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চল, তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্ব এলাকা ও ইরানের পশ্চিমাংশকে একত্রে ফার্টাইল ক্রিসেন্ট বলে। ম্যাপে একে দেখতে অর্ধচন্দ্রের মতো লাগে।

২। জ্যোতিষবিদ্যা হলো গ্রহ-নক্ষত্র দেখে পৃথিবীর ঘটনার পূর্বাভাস বলার প্রচেষ্টার নাম, যার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। একে মানুষ অনেক সময় জ্যোতির্বিদ্যার (astronomy) সাথে গুলিয়ে ফেলেন, যা বিজ্ঞানের একটি শাখা।

৩। এগুলো গ্রিক ভাষার বড় হাতের অক্ষর। আমরা সাধারণত ছোট হাতের অক্ষর দেখি। ছোট হাতের ইটা হলো η এবং মিউ হলো μ।